পশ্চিমা বিভ্রান্তি

বনাম

রাসূলুল্লাহ সা. এর

বংশমহিমা

পশ্চিমা বিভ্রান্তি বনাম
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমহিমা

মুসা আল হাফিজ

ফাউন্টেন
পাবলিকেশন্স

প্রকাশকের কথা

ইতিহাসে কখনও সত্যের পাশাপাশি জন্ম নেয় সংশয়, আর সংশয়ের ছায়ায় কখনও কখনও ঢেকে যেতে চায় সুপ্রতিষ্ঠিত বাস্তবতাও। বিভ্রান্তির কালোমেঘ বনাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমহিমা গ্রন্থটি সেই ছায়া ভেদ করে এক প্রাচীন, সুসংহত ও ঐতিহাসিক সত্যকে পুনরুজ্জীবিত করার আন্তরিক প্রয়াস।

সমকালীন বাংলাদেশের মুসলিম চিন্তক ও বুদ্ধিজীবীদের অগ্রভাগে যার নাম উচ্চারিত হয় গভীর শ্রদ্ধার সাথে, তিনি হলেন মুসা আল হাফিজ। জ্ঞান-গবেষণা, ইতিহাসমনস্ক বিশ্লেষণ এবং প্রাঞ্জল অথচ দৃঢ় লেখনভঙ্গির মাধ্যমে তিনি ইতোমধ্যেই চিন্তার জগতে স্বতন্ত্র এক অবস্থান নির্মাণ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ধারার উৎসসমূহে তার নিবিড় অন্বেষণ, দলিলনির্ভর আলোচনায় অবিচলতা এবং জটিল বিষয়কে সুসংহত রূপে উপস্থাপনের ক্ষমতা তাকে সমকালীন বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে।

বিভ্রান্তির কালোমেঘ বনাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমহিমা গ্রন্থটি তার সেই পাণ্ডিত্যেরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

এখানে তিনি প্রথাগত আবেগ কিংবা আনুগত্যের ভাষা এড়িয়ে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বাইবেলীয় বর্ণনা, আরবি সাহিত্য ও ইসলামি উৎসসমূহকে পাশাপাশি রেখে একটি সমন্বিত বিশ্লেষণ নির্মাণ করেছেন। প্রাচ্যবিদদের অনুমান, বিশেষত William Muir ও Montgomery Watt-এর বক্তব্য—তিনি যুক্তি ও তথ্যের মাপকাঠিতে বিচার করেছেন।

লেখকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি বিতর্কিত বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করেন, কিন্তু ভাষায় শালীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভারসাম্য বজায় রাখেন।

ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অনুসন্ধানে তার ধৈর্য, উৎস-সমালোচনায় সতর্কতা এবং প্রমাণের স্তরবিন্যাসে দক্ষতা এ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পাঠক এখানে দেখতে পাবেন একজন গবেষকের স্বচ্ছ মানস, একজন ইতিহাসপাঠকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ এবং একজন দায়বদ্ধ মুসলিম চিন্তকের আন্তরিকতা।

আমাদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থ কেবল একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয় না; বরং পাঠককে দলিলনির্ভর চিন্তার এক উচ্চতর মানদণ্ডের সঙ্গে পরিচিত করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমহিমা বিষয়ে যে বিভ্রান্তির কালোমেঘ তৈরি করা হয়েছে, তা অপসারণে এই বই এক শক্তিশালী বৌদ্ধিক অবদান। আমরা বিশ্বাস করি, এই গ্রন্থ গবেষক, শিক্ষার্থী ও সচেতন পাঠকমহলে সমাদৃত হবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমহিমা নিয়ে চলমান বিভ্রান্তি নিরসনে তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

— প্রকাশক

আব্দুর রহমান আদ-দাখিল

সূচিপত্র

- অনুমানের মেঘ.. ৯
- জাহিলি আরবে বংশচিন্তা.. ৯
- বংশলতিকা সাজানোর বিপদ..১৩
- কুরাইশের বংশমহিমা... ১৪
- ম্যুর-ওয়াটের অনুমান ১৫
- সত্য বিকৃতির পায়তারা..১৮
- প্রাচীন কাব্যে ইবরাহিম ও ইসমাইল আ. ২১
- বাইবেলের ইসমাইলিরা.. ২২
- ইসমাইলের রক্ত ও আরব জাতি.. ২৯
- আরব সংস্কৃতির মর্মমূলে ইবরাহিম আ.................................. ৩৩
- আরবে নবি না আসার অতীত...৩৭
- মুসা-ইবরাহিম আ. বনাম মক্কা-মদিনা ৪০
- ইতিহাসের কণ্ঠস্বর... ৪২
- মহানবি ﷺ-এর ইসমাইলি বংশসূত্রের কুরআনি ভাষ্য..................... ৪৪
- হাদিসভিত্তিক প্রমাণ.. ৪৭
- যে মহিমা অক্ষয়...৬২

বিভ্রান্তির কালোমেঘ বনাম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বংশমহিমা

অনুমানের মেঘ

বংশীয় মহিমা নবিদের সম্মানের বিশেষ দিক। একে অবজ্ঞা করার চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেছে বহু পশ্চিমা মেধা। এই ধারার প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশি আক্রমণ করেছে হজরত মুহাম্মাদ ﷺ-কে। মধ্যযুগের আক্রমণগুলো এতো উদ্ভট, যা কোনো জবাবেরও যোগ্য নয়। আধুনিক কালপর্বে প্রাচ্যবিদদের অনেকে মহানবির ﷺ বংশধারা নিয়ে তৈরি করেছেন বহু অনুমান। একটি বিখ্যাত হাইপোথিসিস তৈরি হয়েছে ইসমাইল আ.-এর সাথে নবিজির ﷺ সম্পর্ক নিয়েও। জোর দিয়ে তারা বলতে চেয়েছেন, ইসমাইল আ.-এর সাথে মুহাম্মাদ ﷺ এর রক্তসূত্রের সম্পর্ক প্রমাণিত নয়। এটা বরং নবির ﷺ সম্মান বাড়াবার ইচ্ছায় তৈরি করা এক কারসাজি!

জোরালো সুরে তারা একে উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু আপত্তিগুলোর সারবস্তু কি? আমরা যদি বিষয়টার মর্মমূলে প্রবেশ করি, তাহলে লক্ষ্য করব—বিবিধ বুদ্ধিবৃত্তিক জোড়াতালির মধ্য দিয়ে এসব অনুমানকে সামনে আনা হয়েছে।

জাহিলি আরবে বংশচিন্তা

আরবদের জীবনে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল। তারা নিমজ্জিত ছিল অজ্ঞতা, বর্বরতা, পাপাচার ও অহংকারের পঙ্কিলতায়। কিন্তু অগণিত ত্রুটি সত্ত্বেও কিছু গুণ ছিল তাদের। যা মানব-ইতিহাসে তাদেরকে একটি বিশেষ স্থান

দিয়েছে। সাহস ও বীরত্বে আরবরা ছিল অতুলনীয়। প্রকৃতিগতভাবে তারা ছিল অনন্য স্মৃতিধর। নিজেদের ভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশের এমন সক্ষমতা তাদের ছিল, যার নজির মেলে না। বাগ্মিতা ও উন্নত বাচিকতার অধিকারী আরবরা বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির সহায়তায় শব্দ-বাক্যের জাদু বিস্তারে ছিল পারদর্শী। নিজেদের জীবন ও সংস্কৃতিতে এর প্রভাব ছিল গভীর। প্রতিটি সামাজিক মজলিসে এর প্রভাব কথা বলত। তাদের সাংস্কৃতিক জীবনে একে কেন্দ্র করে জারি থাকত প্রতিযোগিতা। বংশ, বীরত্ব, নেতৃত্বগুণ ও ভাষিক অনন্যতার উৎকর্ষের ভিত্তিতেই সমাজে ব্যক্তি বা তার পরিবারের মর্যাদা নির্ধারিত হতো।

আরবরা খোদাপ্রদত্ত স্মৃতিশক্তি ব্যবহার করে নিজেদের নসবনামা বা বংশতালিকা মুখস্থ করত। প্রতিটি কবিলার প্রধানকে তার গোত্রের বংশতালিকা মুখস্ত রাখতে হতো। একই সাথে সম্প্রদায়ের আওতাধীন সমস্ত উপজাতির বংশতালিকা মুখস্থ রাখাও তাদের জন্য ছিল আবশ্যক। অপরদিকে যেসব গোত্রের সাথে তাদের সংঘাত ও মিত্রতা ছিল, তাদের বংশলতিকাও মনে রাখতে হতো। আরবরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্বকে বংশপরম্পরায় স্মৃতিতে ধারণ করত। বিরোধীদের বংশবৃত্তান্তের দুর্বলতাগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে সংরক্ষণ করত। এর চর্চা করত নিজেদের মধ্যে। এ নিয়ে রচিত হতো কাব্য। এক গোত্রের কবিতা প্রচারিত হলে অপর গোত্র লিখত বিপরীত কাব্য। এসব কবিতার অন্যতম দায়িত্ব ছিল বিরোধিদের বংশকে তাচ্ছিল্য করা এবং নিজেদের বংশকে উচ্চতর প্রমাণ করা।

পারিবারিক সম্মানের পাহারায় নিয়োজিত থাকত জীবন ও তরবারি। বিভিন্ন কবিলার অস্ত্রগুলো জড়ো হতো এবং ব্যবহৃত হতো প্রধানত পরিবার ও কবিলার সম্মানের প্রয়োজনে। এরই জন্য সাধারণত যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠত, সাহসী যোদ্ধারা বীরত্ব ও দক্ষতার চমক প্রদর্শন করত। এই বীরত্বের কীর্তিসমূহ তাদের ঐতিহ্য ও গরিমায় পরিণত হতো। প্রত্যেক প্রজন্ম তাদের পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কীর্তিগুলো সংরক্ষণ করত স্মৃতিতে, আবৃত্তি করত কাব্যে, পুনরাবৃত্তি করত অভিভাষণে। এতে কোথাও কোনো ত্রুটি হলে

অন্যান্য কবিলার কাছে হাসির পাত্র হতে হতো। জ্ঞানীদের জন্য এর চেয়ে লজ্জা ও অপমানের বিষয় আর থাকত না।

আরবের গ্রাম ও শহরে বংশধারা সংরক্ষণের রীতি অন্যান্য রীতির কেন্দ্রে ছিল। আরব রক্ত অনারব রক্তের সাথে যেন না মিশে, সেটা তারা একান্তভাবে চাইতেন। ফলে অনারবদেরকে বিয়ে করা তাদের কাছে রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়নি। একে বরং আরবরা অপছন্দ করত। নুমান বিন মুনজিরের কন্যাকে বিয়ে করতে চাইলেন পারস্যের সম্রাট কিসরা। কিন্তু স্বয়ং সম্রাটের তরফে প্রস্তাব আসার পরও নুমান তার কন্যাকে বিয়ে দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এর পেছনে বিশুদ্ধ আরব বংশরক্ষার ব্যাপারটা ছিল মুখ্য। বংশলতিকা তাদেরকে দম্ভ সরবরাহ করত। এসবের পেছনে তারা সময় ব্যয় করত বিস্তর। কুরআন তাদের এই প্রবণতার স্পষ্ট সমালোচনা করেছে। একে অন্যের ওপর আধিক্য ও প্রাধান্য লাভের প্রতিযোগিতাকে তাকাসুর বলে কুরআন নিন্দা করেছে। এই প্রতিযোগিতার প্রধান এক খাত ছিল বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বনেশা। আল্লাহর রাসূল ﷺ আরবদের এই প্রবণতাকে সমালোচনা করেন। বংশীয় অহং ও দম্ভকে তিনি জাহিলিয়াতের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ঘোষণা করেন।[১]

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত। নবি ﷺ ইরশাদ করেন :

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِآبَائِهِمْ الَّذِيْنَ مَاتُوْا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُوْنُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِيْ يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ.

নিজেদের মৃত বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্বকারীদের সতর্ক হওয়া

[১] মুসলিম : ৯৩৪, মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৩৮৩, তাবারানি-কাবির : ৩৪২৫, ৩৪২৬।

> উচিত—তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। কারণ, তারা তো মূলত জাহান্নামের কয়লা। অন্যথায় তারা আল্লাহ তাআলার কাছে মল-কীটের চাইতেও অধিক মূল্যহীন বলে বিবেচিত হবে। আর মল-কীটের কাজই তো শুধু নাক দিয়ে মল-খণ্ড ঠেলে নেওয়া। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে জাহিলি যুগের হঠকারিতা তথা নিজেদের বাপ-দাদাদেরকে নিয়ে গর্ব করা থেকে পবিত্র করেছেন। মূলত মানুষ তো শুধুমাত্র দু-প্রকারের হয়ে থাকে : মুত্তাকি ঈমানদার অথবা দুর্ভাগা পাপী। সকল মানুষই তো আদমসন্তান। আর আদম আ.-কে তো মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এতে একের অন্যের ওপর গর্বের কী-ইবা আছে?[২]

জাহিলি যুগের কঠোর সমালোচনা জরুরি ছিল। বংশগরিমাকে দেবতাসমান গুরুত্ব দিত তারা। মানুষ তো বটেই, আরবরা তাদের উট-ঘোড়া ইত্যাদির বংশনামাও মুখস্ত রাখত। কে স্বাধীন নারীর গর্ভজাত আর কে দাসির গর্ভে জন্মগ্রহণকারী, এই বিবরণীও তারা সংরক্ষণ করত। কে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকের দুধ পান করেছে আর কে নিম্নকৃষ্টির বা নিম্ন বংশীয় নারীর দুধ পান করেছে, এটাও ছিল তাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধকালে সালমা ইবনুল আকওয়া রা. বক্তব্য থেকেও ব্যাপারটা অনুভব করা যায়। তিনি বলেছিলেন : أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ وَالْيَوْمَ يَوْمُ الرُّضَّعِ—‘আমি আকওয়ার পুত্র আর আজ বোঝা যাবে, কে সম্ভ্রান্ত স্বাধীন রমণীর দুধ পান করেছে আর কে পান করেছে দাসির দুধ।[৩] বংশসম্পর্কিত যাবতীয় তথ্যচর্চার জন্য একদল বিশেষজ্ঞ শ্রেণির সৃষ্টি হয়, যাদের কদর ছিল অনেক বেশি। আরবরা তাদেরকে বলত ‘নাসসাবুন’ বা বংশলতিকা বিশেষজ্ঞ। কোথাও বংশধারা নিয়ে কোনো সংশয়ী ব্যাপার বা জিজ্ঞাসা হাজির হলে সত্য-তথ্যের জন্য তাদের শরণ নিত মানুষ।

---

[২] তিরমিজি : ৩৯৫৫, সহিহুল জামে’ : ৫৪৮২।

[৩] বুখারি : ৪৭২৭, মুসলিম : ১৮০৭।

বংশলতিকা সাজানোর বিপদ

এই যখন পরিস্থিতি—তখন কার পক্ষে সম্ভব হতো আরবদের ঐতিহ্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা? কার পক্ষে সম্ভব হতো আরবদের কোনো বংশধারাকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী সজ্জিত করা? আরবদের বংশ দূরে থাক, নিজের গোত্র বা উপগোত্রের বংশধারাকেও ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নেওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না কারো জন্য। বংশসূত্রের ঐতিহ্য আরবদের সম্মিলিত স্মৃতি ও মহিমার ঘোষক ছিল। প্রত্যেকের ঐতিহ্যগুলো তাদের শত্রুদেরও মুখস্থ থাকত। এমতাবস্থায় এটি কল্পনা করাও অসম্ভব যে, একজন ব্যক্তি নিজের বংশধারাকে হঠাৎ করে ভুলভাবে বর্ণনা করবেন এবং গোটা আরব তা মেনে নেবে। কেউ একে প্রত্যাখ্যান করবে না!

আরবরা সত্যিই মন্দের পঙ্কিলতায় ডুবে ছিল। মাথা থেকে পা পর্যন্ত নিমজ্জিত ছিল অন্ধকারে। কিন্তু আত্মঘাতী বাস্তবতা সত্ত্বেও তারা মিথ্যাকে ঘৃণা করত। কেউ মিথ্যাবাদী হিসেবে জনগণের মধ্যে পরিচিত হবে, এটা ছিল তাদের কাছে চূড়ান্ত অপমান। তাই তারা মিথ্যা বলতে ভয় পেত। এই ভয়েই আবু সুফিয়ান ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও হিরাক্লিয়াসের দরবারে মহানবি ﷺ-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলতে পারেনি।[৪]

নবিজি নবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন। গোটা আরবের কুসংস্কার তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। নবিজির দাওয়াতকে দমানোর জন্য এমন কোনো উপায় নেই, যা তারা অবলম্বন করেনি। তার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব ধরনের অপবাদ দিয়েছে তারা। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য করতে পারেনি। এখন কথা হচ্ছে, তিনি যদি নিজের বংশধারায় কারসাজি করতেন, তাহলে এই বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপনে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করত না তারা। কিন্তু কেউই এমনতরো কোনো অভিযোগ উচ্চারণ করেনি। বরং তাদের নেতা আবু সুফিয়ান বাইজেন্টাইন রাজদরবারে স্বীকার করেছে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে কখনও মিথ্যার জন্য অভিযুক্ত বা সন্দেহ করা হয়নি।[৫]

---

[৪] বুখারি : ৭, মুসলিম : ১৭৭৩, মিশকাত : ৫৮৬১।

[৫] প্রাগুক্ত

কুরাইশের বংশমহিমা

ঐতিহাসিকরা জাজিরাতুল আরবের অধিবাসীদের তিন ভাগে ভাগ করেন। আরবে বায়েদা, আরবে আরিবা ও আরবে মুস্তারিবা। আরবে বায়েদা ইসলাম আগমনের আগে ধ্বংস হয়ে যায়। আরবে আরিবা হলো ইয়াশজুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতানের বংশধররা। এদের আরেক নাম কাহতানি আরব। কাহতানি এই আরবদের মূল আবাসভূমি ছিল ইয়েমেন। সেখানে সাবা বিন ইয়াশজুব বিন ইয়ারুব বিন কাহতানের সন্তানরা বহু শাখা-উপশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। সাবার সন্তানদের মধ্যে দুই গোত্র পরবর্তীতে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়। এক গোত্রের নাম হিমইয়ার ইবনে সাবা, আরেক গোত্রের নাম কাহলান ইবনে সাবা। তাদের মধ্যে ছিল আরও এগারো বা চৌদ্দটি গোত্র। যাদেরকে বলা হতো সাবিউন। এদের মধ্যে কেবল একটি গোত্র অবশিষ্ট ছিল, বাকিদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। অপরদিকে আরবে মুস্তারিবরা ছিলেন ইবরাহিম ও ইসমাইল আ.-এর বংশধর। তাদেরকে বলা হতো আদনানি। মক্কা ও পবিত্র কাবা ছিল তাদের বিকাশের কেন্দ্র।

আরবের অন্য যেকোনো প্রামাণ্য ঐতিহ্যের চেয়ে বেশি প্রামাণ্য সত্য হচ্ছে, কাবাঘর হজরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আ. নির্মাণ করেছিলেন। তাদের বংশধররা পরবর্তী আরবের প্রধান জনশক্তি হয়ে উঠেন। সেই মুস্তারিব আরবদের সবচেয়ে সম্মানিত গোত্র ছিল কুরাইশ। কুরাইশের একটি প্রধান ও বিশিষ্ট শাখা হলো বনু হাশিম। হাশিমের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও সরদার পুত্র আবদুল মুত্তালিব হলেন মহানবির ﷺ দাদা।

ফিহির বিন মালিক ছিলেন মক্কায় কুরাইশ বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার ডাকনাম কুরাইশ থেকেই মক্কায় বসবাসকারী ইসমাইল আ.-এর বংশধরদের আখ্যায়িত করা হয় কুরাইশ নামে। কুরাইশরা ছিলেন মক্কায় কাবা শরিফের ধর্মীয় প্রতিনিধি। তাদের সম্মানের কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল এটি। নিজেদের দক্ষতা দিয়ে গোটা আরবে তারা প্রতিপত্তি নিশ্চিত করেন। কাবাঘরের রক্ষক ও সেবক হিসেবে সমগ্র আরবে কুরাইশের বিশেষ মর্যাদা ছিল। ভৌগোলিক কারণেও মক্কা ছিল বাণিজ্যিক কেন্দ্র। বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্যে কুরাইশ

গোত্রের ছিল বহুমাত্রিক সুবিধা, সম্মান ও ঐতিহ্য।

আরবদের কাছে ঐতিহ্য ছিল রক্তের চেয়েও মূল্যবান। বংশের অতীত সন্ধানের প্রথা আরবদের যেকোনো ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের চেয়ে বেশি জীবন্ত ছিল। নিজেদের ঐতিহ্যের মূলে তারা নির্দেশ করতেন দ্বীনে হানিফ বা ইবরাহিম আ.-এর প্রবর্তিত ধর্মকে। আরবদের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনবরত ইবরাহিম আ.-এর সাথে নিজেকে লগ্ন করেছে।

সব আরব গোত্রই কুরাইশদের সম্মান করত। সম্মানের মূলে ছিল আল্লাহর ঘর, কাবাতুল্লাহ। তারা কাবাঘরের রক্ষক ও সেবক ছিল। এই পবিত্র ঘর হজরত ইবরাহিম ও ইসমাইল আ. নির্মাণ করেছিলন। এখানে হজ ও তাওয়াফের সিলসিলা তাদেরই শিক্ষা। হজ-উমরা ও হাজিদের ব্যবস্থাপনার মহান দায়িত্ব কুরাইশকে সম্মানিত করে তোলে। যখন দস্যুতা ও যুদ্ধমগ্ন মরুভূমিতে কোনো কাফেলার নিরাপত্তা থাকত না, তখনো কুরাইশদের কাফেলাগুলো নির্ভয়ে বিচরণ করত মরুভূমিতে, তারা ঘুরে বেড়াত সিরিয়া ও ইয়েমেনের বিস্তীর্ণ এলাকায়। আরবের সীমানা পেরিয়ে রোমান সীমান্ত-অঞ্চলেও ছিল তাদের প্রতি সমীহ ও স্বীকৃতি। পারস্যের সীমান্ত অঞ্চলও কুরাইশদের আভিজাত্য ও উচ্চবংশীয় মহিমাকে বরণ করত। কুরাইশরা যে ইসমাইল আ.-এর বংশধর, এই প্রশ্নে কেউ আপত্তি তুলেনি কখনও—না জাহিলি যুগে এমন আপত্তি উঠেছে, আর না ইসলাম পরবর্তী হাজার বছরে।

ম্যুর-ওয়াটের অনুমান

হঠাৎ করে উনিশ শতকের কিছু প্রাচ্যবিদ কথাটা পাড়লেন। তারা না ছিলেন আরবের কেউ, না আরব ঐতিহ্যের কোনো ধারক। না আরবি ভাষা ও সংস্কৃতির মর্মমূলকে স্পর্শ করতে পেরেছেন, না এর সাথে ছিল কোনো নিবিড় বন্ধন। উল্টো বরং ইসলাম ও আরব ঐতিহ্যের সাথে দীর্ঘ শত্রুতার উত্তরাধিকার বহন করছিলেন তারা। তাদের চারপাশে ছিল লজ্জাজনক অপব্যাখ্যা ও উদ্ভট দাবি-দাওয়ার স্তূপ। সেই স্তূপের ওপর বসে মহাসমুদ্রের ওপার থেকে তারা সহসা উচ্চারণ করলেন কুরাইশরা ইসমাইলের বংশধর

নয়। এই দাবির পেছনে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। কোনো প্রামাণ্যতার ধারও তারা ধারেননি। কেবলই গায়ের জোর, কেবলই অনুমান।

তাদের দাবির প্রাথমিক প্রবর্তকদের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব হলেন উইলিয়াম ম্যুর (১৮১৯-১৯০৫ খ্রি.)। তিনি দাবি করেন—

> ইসলামের নবি ﷺ-কে হজরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর হিসেবে গণ্য করা হোক এবং তিনি হজরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর বলে প্রমাণিত হোন—এই আকাঙ্ক্ষা তার জীবনে জন্মেছিল... এ জন্য, রাসূল ﷺ-এর আব্রাহামিক বংশধারার প্রাচীনতম ধারা উদ্ভাবন করা হলো। ইসমাইল আ. ও বনি ইসরাইলের অসংখ্য কাহিনি অর্ধেক ইহুদি ও অর্ধেক আরবি ছাঁচে ঢালাই করা হলো।[৬]

এই প্রথম শোনা গেল নবি-বংশের ইসমাইলি পরম্পরাকে প্রত্যাখ্যানের সুর। *The life of Mahomet* গ্রন্থের ভূমিকায় ম্যুর এই বিস্ফোরক অনুমান উপস্থাপন করেন। কোনো প্রামাণ্য সূত্রের দরকার ছিল না ম্যুরের। স্থির সিদ্ধান্তের মতো তিনি দাবি করেন—

> আরব ঐতিহ্য আরবদের ইসমাইলি বংশের কথা জানত না। মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরাইশ ইবরাহিম আ. ও ইসমাইল আ.-এর বংশধর ছিলেন, এটাও মানুষ জানত না। এই বংশসূত্রের কথা তখনই প্রচারিত হলো, যখন রাসূল ﷺ এর মধ্যে বংশীয় আভিজাত্য ও পারিবারিক মর্যাদার আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয়। তিনি তার বংশকে হজরত ইবরাহিম আ.-এর সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করলেন। এ জন্য এমন কল্পকথা তৈরি করা হয়, যা দ্বারা হজরত ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে মুহাম্মাদ ﷺ-এর বংশগত সম্পর্ক প্রমাণিত হতে পারে।

উইলিয়াম ম্যুরের তৈরি অনুমানকে এক ধাপ এগিয়ে নেওয়া জরুরি। তাই

---

[৬] মুহাম্মদ ইহসানুল হক সুলায়মানি, রাসূলুম মুবিন, মকবুল একাডেমি লাহোর, ১৯৯৩, পৃ : ৯৪। উদ্ধৃত : লাইফ অব মুহাম্মদ, উইলিয়াম ম্যুর।